জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া

ফটিক চাঁদ ঘোষ

বিশ্বসাহিত্যে ছোটোগল্প শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি হয়ে উঠেছে। তা বহুদিন ধরে বহুচর্চিত বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে। পো থেকে জোলা, চেখভ, গোর্কি—অজস্র নাম উচ্চারিত হতে পারে এই ধারায়। ফলে স্বভাবতই বাংলা ছোটোগল্পের আলোচনায় বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে প্রাপ্ত বিচিত্র যুগোত্তীর্ণ ছোটো গল্পগুলির তুলনা মনে আসে। বাংলা ছোটোগল্পও কী সংখ্যায় কী বৈচিত্র্যে খুব যে পিছিয়ে—এমনটাও নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই পল্লিজীবনের পটভূমিকায় যা শুরু হল— তারপর অনেক অনেক গল্পকারের হাত ধরে নানা সাহিত্য আন্দোলন, সামাজিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, যৌনতা—যৌন বিকার, রোম্যান্স—বাংলা ছোটো গল্প সবকিছুকে ধারণ করে আছে সগৌরবে। যুগের পর যুগ—দশকের পর দশক—সমাজ বদলেছে, সাহিত্য ভাবনা বদলেছে আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বদলেছে ছোটোগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক। রবীন্দ্রযুগ পেরিয়ে কল্লোলযুগে সে মোড় নিয়েছে—তারপর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ ব্যাপারও ধারণ করেছে ছোটোগল্প। এককথায় ব্যক্তিজীবনের মন, গৃহস্থের রান্নাঘর আর দেশ ও রাজনীতি এবং বিশ্বব্যবস্থা সবই ছুঁয়ে আছে বাংলা ছোটোগল্পের প্রান্ত। সে ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। শুধু একটা কথা স্মরণে রাখতে হবে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে নিরালম্ব, অনাস্থা, বিশ্বাস ও আস্থাহীনতা, বস্তুবাদীদের মতো নির্মম নগ্ন বাস্তবকে দেখা ও দেখানোর প্রক্রিয়া শুরু হল তা আজও বহমান। কোথাও আস্থা রাখার স্থান নেই আমাদের আজ। বিশেষত বুর্জোয়া পৃথিবীর দুঃস্বপ্নের কাছে—যে মার্কসবাদ নতুন দিশা আশ্বাস ও বিশ্বাস এনে দিয়েছিল মাত্র কয়েক দশক পরেই তার বিকার, দৃষ্টিভঙ্গি বদল পীড়া—মানুষের ন্যূনতম বিশ্বাসও ভেঙে দিল। স্বাধীনতার পরও একের পর এক বিদ্রোহ, অর্থনেতিক দৈন্য, দুর্নীতি, একমুঠো ভাত ও একটু আশ্রয়ের জন্য হাহাকার—ছোটোগল্প ধারণ করেছে। কিন্তু অমল অমূল্য অপরিমেয় অথবা পরিমিত কোনো বিশ্বাসের ভুবন স্বপ্ন হয়েও আর ধরা দিতে পারেনি তার কাছে। আধুনিক কবিতার মতো বাংলা আধুনিক গল্পও চাই ভাঙা ভুবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আর্তনাদ করেছে। চেতনার উত্তরাধিকার তাকে শান্তি দেয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প এই পটভূমিতেই বিচার প্রবৃত্ত হয়েছি আমরা। না বিচার নয়—শৈল্পিক মানদণ্ডে মাপজোঁকও নয়। শিল্পকে কাটাছেঁড়া করার এই এক্তিয়ার আমার নেই। কিন্তু গল্পগুলি পড়তে পড়তে যে অনুভব সন্তুষ্টি অথবা অতৃপ্তি আমাদের ভাবায় তারই

নিরিখে গল্পগুলিকে ফিরে দেখা। এবং বাংলা গল্পের ধারায় তার অবস্থানকে স্বীকার করাই আমাদের কাজ।

জ্যোতিরিন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ২০ আগস্ট ১৯১২ এবং মৃত্যু হয় ৩ আগস্ট ১৯৮২। এই সময়কালটা উল্লেখের কারণ বাংলা সাহিত্য স্রোতের কোন কোন ঘটনা তিনি ছুঁয়ে গেছেন তা দেখানো—নতুবা স্পষ্ট হবে না তাঁর রচনার ভঙ্গির উৎস নির্দেশ, বিষয়ের পরিচয়। কোন উত্তরাধিকার তিনি বহন করে আনলেন। কোন সংস্পর্শে তিনি প্রবাহিত হলেন এবং তার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য তিনি অর্জন করলেন—তা সময়ের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হবে। তাঁর গল্পের বিষয়ের সঙ্গে 'কল্লোল' যুগের কোথায় যেন একটা মিল আছে। বিশেষত, নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক, কেরানির দারিদ্র্য, নানা প্রবৃত্তি অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রমুখকে মনে করায়। অন্যদিকে যে মনস্তত্ত্ব ক্রমাগত বড় হয়ে উঠতে থাকে, জ্যোতরিন্দ্রনাথ তাঁকেও আত্মীকরণ করেন। বিষয়ের দিক থেকে দারিদ্র্য, দাম্পত্য, অতৃপ্তি, যৌনতা, যৌনতার বিকার, নারীর বিচিত্র মানস অভিব্যক্তি তাঁর গল্পের বিষয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রকৃতির সমাবেশ।

প্রতিটি গল্পে প্রকৃতিকে তিনি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছেন। গাছপালা, পশুপাখি, ফুলফল, লতাপাতা—বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ—প্রাণভরে প্রকৃতির এই সুধারস পান করেছেন গল্পকার এবং প্রতিটি গল্পে তাকে আদ্যোপান্ত বিছিয়ে দিয়েছেন, যেমন ঝরা পাতা ও ফুলে ভরে থাকে বাগান কুঞ্জ বা বনভূমি। প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথেও ছিল। তাঁর প্রকৃতি অসীম অনন্তের ব্যঞ্জনাধর্মী। তা গূঢ়, গাঢ়, সাংকেতিত সৌন্দর্যের। রূপ থেকে অরূপের সোপান। এসব তত্ত্বকথা আমাদের আলোচ্য গল্পকারের গল্প সম্পর্কে সাজে না। তবু প্রকৃতিকে এমন করে ছোটোগল্পে ব্যবহার খুব কম লেখকই করেছেন।

মনস্তত্ত্ব আধুনিক সাহিত্যের যে অন্যতম বিষয় আমরা তা জানি। তবু জ্যোতিরিন্দ্র গল্পে কোথাও কোথাও তা ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। এই মনস্তত্ত্ব বিচিত্র জটিল, কুটিল। তাই এর বহিঃপ্রকাশ কখনও চৌর্যবৃত্তি, কখনও হিংসা, কখনও হত্যা, কখনও হত্যার চেষ্টা। অবচেতন আর অবদমিত ব্যাপার কুটিল বক্রগতিও দেখিয়েছেন লেখক। নরনারীর সম্পর্কের, দাম্পত্যের এমন সব জীবনযাপনের পরিচয় দিয়েছেন যা পুরনো হয়েও নতুন বলে মনে হবে। অথচ ঘটনা হিসেবে সেগুলি যে খুব বড় এমনটা নয়। চলতে চলতে যা উঠে আসে। যা দেখা যায় অথবা দেখা যায় না। আমরা প্রত্যেকেই যা বহন করে চলি—গ্রহণের বেলায় দ্বিধান্বিত হই, অথবা যা আকস্মিক বহিঃপ্রকাশে বিষিয়ে দেয় আমাদের জীবন। আমরা চমকে যাই। ঘৃণার হলেও তাকে ঘৃণা করতে পারি না, ত্যজ্য হলেও তাকে ত্যাগ করতে পারি না।

দাম্পত্যের মধ্যেকার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বিচিত্র বাসনা, নারীর বিচিত্র আচরণ জ্যোতিরিন্দ্রের অনেকগুলি গল্পে দেখা গেছে। এগুলিকেই আমরা কল্লোল যুগের উত্তরাধিকার এবং সময়ের পটে তার বিবর্তিত রূপের পরিচিতি বলে উল্লেখ করেছি। শান্ত, নিরাসক্তভাবে লেখক তাকে এঁকেছেন। কিন্তু বলেছি আমরা এতেই ভেঙেছে বিশ্বাসের ভুবন। অসুখী দাম্পত্যে নারী চেয়েছে অন্য জীবন অন্য স্বাদে। তা অপেক্ষাকৃত ভালো বা

মন্দের বিচারে নয়। অস্তিত্বের স্বীকৃতির বা ভিন্ন স্বাদের আকাঙ্ক্ষায়। নারী মনের চির রহস্যলোকের উন্মোচনে লেখক এখানে সক্রিয়। 'নষ্টনীড়' এর যুগ থেকে আমরা অনেক এগিয়েও হয়তো একই সমস্যার জোয়ার ভাটায় এখনও ভাসমান। জীবন কোনো চির বিশ্বাস চির আশ্বাস ও আস্থার জায়গায় পৌঁছে দেয়নি আমাদের—এখনও।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ঘটেনি আমাদের। শ্রেণিবিন্যাস, শ্রেণিশোষণ রূপ বদলেছে মাত্র। এই দারিদ্র্যের নগ্ন পরিচয় তেমন না দিলেও কোনো কোনো গল্পে দারিদ্রই নিয়ন্ত্রণ করেছে চরিত্রের পরিণতিকে। গল্পের অবয়ব জুড়ে সেই দারিদ্র্যের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। কিন্তু তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেননি তেমন। অর্থাৎ একে যে বদলানো দরকার—এমনটা মনে হয় না আমাদের গল্পপাঠের পর। বরং চরিত্রটির প্রতি সামান্য সহানুভূতি জন্মায় আমাদের, অন্যমনস্ক করে। কিন্তু তার অপমানের প্রতিকারের কথা ভাবিনা আমরা। সে দায় লেখকের কিনা এ প্রশ্ন বিদগ্ধ পাঠক করতে পারেন কিন্তু আমরা যারা শিল্পকে সমাজ বদলের হাতিয়ার ভাবি— তারা আক্ষেপ করতে পারি।

বিষয়বস্তুর বিচারে, বর্ণনার কৌশলে, চরিত্র সৃজনে, নাটকীয়তা বা পাঠকের আকাঙ্ক্ষাকে গল্পের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা, ধর্ম, দর্শন, বিশ্বব্যবস্থা, রাজনীতি—এসবের ব্যবহারে এমন মহৎ কোনো গল্প লেখেননি জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর কোনো গল্পই এই মাত্রা স্পর্শ করেনি। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যে অভিনবত্বে তা গ্রহণীয়। বর্ণনাগুলি বিস্ময়ে উদ্রেককারী। সামান্য তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করেই তাঁর গল্প কেবল লেখকের রচনাশৈলীতে অন্য মাত্রা স্পর্শ করে। কিন্তু বিস্ময়ে চমৎকারিত্বে, অভিনবত্বে, জীবন দর্শনের উচ্চতায় সৃষ্টি যে বহুমাত্রিক অবিস্মরণীয়, দেশকালোত্তীর্ণ একটি শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে—তেমন গল্প কি জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছেন? জোর করে একথা বলা যায় না। কিন্তু বাংলা ছোটোগল্পের ধারা থেকে তাঁকে সরিযে রাখারও উপায় নেই। প্রকৃতি, দারিদ্র্য, মনস্তত্ত্ব, নারীদেহ, রাজনীতি—প্রায় প্রতিটি বিষয়কে স্পর্শ করেছেন তিনি। কিন্তু কোনো কিছুই বিস্ফোরক হয়ে ওঠেনি তাঁর গল্পে। কিন্তু পৃথক পৃথক গল্পে পৃথক পৃথক ভাবে মানুষকে তার জীবনকে, দৈনন্দিন বেঁচে থাকাকে এগুলি ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। গল্পের পরিণতি এনেছে। পরতের পর পরত তাকে গল্পে সাজিয়েছেন লেখক। উন্মোচিত অনাবৃত করেছেন স্তরীভূত পুঞ্জীভূত বোধকে।

ঠিক এভাবেই যৌনতা তাঁর গল্পে একটি প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে। দাম্পত্য অথবা দাম্পত্যের বাইরে। তার রকমফের আমাদের অভিভূত করে। এমনকী কিশোরদের নিয়ে যে গল্প তিনি লিখেছেন তাদের যৌনতার আবিল প্রকাশও বিস্ময়কর। কিশোরদের তিনি অপাপবিদ্ধ, কমনীয় পবিত্র বলে আঁকেননি। তাদের বয়ঃসন্ধির অভিনব যৌনচেতনার, লালসার বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে তা অনেক বেশি বাস্তব। কিন্তু এ যৌনতা বিকারগ্রস্ত। যদিও আধুনিক সমালোচক 'বিকার' শব্দটি নিয়েই আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু একথা বিস্মৃত হওয়ার নয়— সব যৌনতা স্বাভাবিক নয়—আজকের মানদণ্ডেও তার একটা বিচার করা চলে। এইসব গল্প- সাহিত্য পাঠকের বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু এই নঞর্থকতাই আধুনিকতা নয়। 'আধুনিকতা' কেবল দারিদ্র্য, হাহাকার, বিকৃত যৌনতা, অনাস্থা, বিতৃষ্ণা, জীবন যন্ত্রণাকেই দেখায় না। আধুনিকতা জীবনের 'সামগ্রিকতা'।

তার দুই দিককে তা উদ্ভাসিত করে। সব নেতিবাচকতা অতিক্রম করে জীবনের প্রতি পূর্ণ আস্থার নামই আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ যে আজও আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকেন, বেদ, রামায়ণ, গীতাও যে এখনও পাঠ্য—তার মূলে রয়েছে এক আস্তিক্যবাদ—হাঁ বাচকতা। বেঁচে থাকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। সব ঘৃণা, অবিশ্বাস, সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে কেবল আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। নেতিবাচকতার ভুবন 'আধুনিকতা'য় আখ্যায়িত হতে পারে না। শেষত জীবন সুন্দর। এই মেসেজ সব মহৎ শিল্পই বহন করে। বিধ্বংসী ট্র্যাজেডিও জীবনের মহত্বকে জীবন পিপাসাকে ইঙ্গিত করে। ফলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কতখানি আধুনিক তাঁর গল্প বিচারে সেকথাও স্মরণ রাখতে হবে আমাদের।

প্রকরণের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে—বর্ণনাই লেখকের প্রধান কাজ। তাঁর গল্পে গল্প বা কাহিনি একেবারে গৌণ। যেটুকু আছে তা আছে গল্পের শেষে। লেখক কেবল বর্ণনা করেন। চরিত্রের মানসিক অবস্থা, প্রতিবেশ, প্রকৃতি। 'ডিটেলস' তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ণনায় বর্ণনায় কাহিনি এগিয়ে চলে। কাহিনি বলতে ওই 'অবস্থা'। সবসময় যে এই বর্ণনা খুব হৃদয়- গ্রাহী—তা নয়। কখনও কখনও তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ক্লান্তিকর লাগে। কখনও বা সেই বর্ণনার সরণী বেয়ে আমরা অনায়াসে পৌঁছে যাই চরিত্রের মনেপ্রাণে চিন্তার গহনে। আর গল্পের পরিণতিও গ্রহণ করি আনন্দে। এই বর্ণনায় মানবচরিত্র যেমন তেমনি প্রকৃতির বর্ণনা দেন লেখক প্রকৃতি কখনও পটভূমি, কখনও চরিত্রের মনের অবস্থা, কখনও অভিব্যক্তিকে ব্যক্ত করে সফলভাবে। উত্তমপুরুষে লেখা গল্পগুলি বক্তব্যের গুণে অনেক বেশি প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয়ে ওঠে।

২

চারপাশে যখন অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে উন্মত্ত ভোগ লালসা, 'লিভ টুগেদার'-এর নামে দায়হীন দাম্পত্য অথবা নিছক যৌন কামনা চরিতার্থতা, সুনীল শীর্ষেন্দুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের বিকৃত যৌনতার উল্লাস তখন জ্যোতিরিন্দ্র আমাদের সামনে নিয়ে আসেন অভাবনীয় ত্যাগ তপস্যা কর্তব্য ভালোবাসার এক দাম্পত্যের গল্প। সমালোচকেরা এ গল্পকে সেরা বা রসোত্তীর্ণের শিরোপা দেবেন না জানি—তবু আমরা যারা জীবনের সামান্য আস্থা ও ত্যাগ তপস্যার কথা বলি—দাম্পত্য বলতে ভোগ বা দাসত্ব দুইকে অস্বীকার করে ভালোবাসা নির্ভরশীলতা ও মানুষে মানুষে বোঝাপড়ার, পাশে থাকার কথা বলি তাদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে বেঁচে থাকে 'নদী ও নারী' গল্পটি। নির্মলা ও সুরপতি নৌকো বাস ও ভ্রমণের সময় আবিষ্কার করে অদূরে সাদা রঙের এক বোটকে। আর তার মধ্যে 'ফ্যাশানের ফানুস' এক নারীকে। যে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরে, শিকার করে, সুরপতির যাকে মনে হয় 'উগ্র রকমের একজন আধুনিকা', অথবা 'ফাঁপা বেলুন'। সেই মেয়েমানুষের বেহায়াপনা দেখে চোখ টাটায় সুরপতি ও নির্মলার। প্রয়োজনে সে নারী দজ্জাল এবং রণরঙ্গিনীও হয়ে ওঠে। একটা পচা ডিমের জন্য তার গলা শাসানি, চোখ রাঙানি—ডিমওয়ালার প্রতি এদের কাছে সেই নারীকে ফড়ফড়ানি সম্বল নারী বলে পরিচিত করায়। সেই নারীকণ্ঠের সংগীত লহরী—শাস্ত্রীয় সংগীত নয়—নিস্তব্ধতা ভাঙে সস্তা থিয়েটারী গলায়। আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যাকে চিতাবাঘ মনে হয়। যে অথচ

অপরিচয়ের কুণ্ঠা কাটিয়ে কথা বলে, আমন্ত্রণ জানায় তাদের বোটে। এমন এক নারীকে বারাঙ্গনা ছাড়া, বাবুদের শখ মেটানো বারনারী ছাড়া, আর কিছু মনে হয় না—হতে পারে না নির্মলা ও সুরপতির।

কিন্তু বোটে গিয়ে তারা যা দেখে শুনে—তাতে লজ্জা পায় তাদের দাম্পত্যও। লজ্জা পাবেন আজকের পাঠকও। তারা দেখে এক পুরুষ বোটের ভিতরে যার একটা হাত কাটা, পা কাটা উত্থান শক্তি রহিত, উদাস নিষ্প্রভ দুই চোখ। তারা জানে বিয়ের প্রথম বছরেই ভাইজাগে বিলেত ফেরত এই ইঞ্জিনিয়ার দুর্ঘটনায় সব হারান। তারপর বুকের দোষ এবং ডাক্তারের আদেশে নদীতে এসে থাকা। এমনকী তিনি অন্ধ। পুরুষটি জানান—'ওর অজস্র প্রাণশক্তি আমাকে ধরে রেখেছে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি নির্মলা। নীলিমা জানায় তাদের উপস্থিতি তাদের জীবনে একঝলক খুশির হাওয়া দিয়ে গেল। কথক জানান—

"সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে সুরপতি ও নির্মলা একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই সাদা ধূসর বোটটার দিকে আর কান পেতে রইল। নারীকণ্ঠের অপূর্ব সংগীত-লহরী সেখান থেকে তখন উঠে আসছিল। জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।"

গল্পের শেষ লাইনটিই শিল্প। গল্পটা সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য।

কিন্তু আধুনিক পাঠকের কাছে একান্ত অবিশ্বাস্য ঠেকবে এই ঘটনা। কেননা এই জীবনে অভ্যস্ত নয় সে। এমনকী গল্প উপন্যাস পাঠেও। অথচ অন্য সময় কত সহজে সে উচ্চারণ করতে পারবে সীতা সাবিত্রীর ভারতবর্ষের কথা। আসলে একটি বৃহৎ ও মহৎ পটভূমি থাকলে এ গল্পটি আরও শক্তি পেতে পারত। যেমন রুশ বিপ্লবের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা প্রায় একই কাহিনির উপন্যাস ভান্দা ভাসিলিয়েভ্‌কা-র 'ভালোবাসা'। জীবনের সবটুকুই ভোগ ও বিকার নয়—এ পৃথিবী আজও মানুষের ভরসাস্থল, আশ্রয়স্থল। নদী ও নারী সেই শাশ্বত ভারত ও শাশ্বত আধুনিকতার গল্প।

'সামনে চামেলি'-এর বিপরীতে যেন এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি। অপ্রাপ্তির বেদনায় ব্যথাতুর। যে সৌভাগ্য উপরের গল্পের পুরুষটির হয়েছিল 'সামনে চামেলি'র যুবকটির তা জোটেনি। কিন্তু সে প্রকৃতি সৌন্দর্য পিপাসু। প্রেমেরও। নারী সৌন্দর্যেরও। কিন্তু প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য যেভাবে সে পাশ করে চরিতার্থ হয়েছে নারীর সামান্য প্রশ্রয় থেকেও সে বঞ্চিত থেকেছে। একটি পঙ্গু প্রতিবন্ধী দরিদ্র, অসহায় যুবকের এই বেদনা এই আর্তি লেখক চমৎকার বিবরণে ও নাটকীয়তায় গল্পে দেখান।

বলেছি আমরা, কবির মতো প্রকৃতিকে দেখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। গল্পের ছত্রে ছত্রে তার বর্ণনা। মানবমন-নারী-প্রতিবেশ চরিত্রের ভাবনা সবকিছুর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে প্রকৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ক্রাচে ভর দিয়ে, এক দরিদ্র প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক, সংসারের বোঝা, দেহের মনের বোঝা বইতে বইতে যে ক্লান্ত সে তীব্র তৃষ্ণায় কলকাতার পথে সৌন্দর্য পান করছে।

"আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার মুখে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। বৈশাখ মাস; তাই বোধকরি সবটা রাস্তার দুপাশে খুব রাধাচূড়া ফুটেছিল। আর ওই যে হলদে ছোট ছোট ফুল।

মে ফ্লাওয়ার?...

"সে ভাবতেই পারেনি কলকাতা শহরে এমন একটা জায়গা; এমন সুন্দর ভীষণ রকম নির্জন কোনো রাস্তা আছে, রাস্তার দু'পাশে গ্রীল দেওয়া সুন্দর ব্যালকনি বারান্দা সিঁড়ি নিয়ে উঁচু উঁচু বাড়ি। অথচ কাউকে তুমি দেখছ না। কেবল যতটা চোখ যায় রাস্তার দুধারে রাধাচূড়া আর মে-ফ্লাওয়ার গাছের সারি। সন্ধ্যার মুখে আলো জ্বলে উঠতে পেভমেন্টের ওপর চিকরি কাটা ছায়ার আলপনা সৃষ্টি করে। এলে রাস্তাটা আরও রহস্যময় মনে হয়। একটু একটু করে ফুলের গন্ধ আসে। হয়তো কোনো ব্যালকনিতেই জুঁই লতিয়ে উঠেছে।"[২]

কিন্তু এই সৌন্দর্য যে দেখে তার বেশভূষা মলিন, চেহারা ম্লান বিষণ্ণ। সে রক্তশূন্যতায় ভোগে। ভিতরের দিক থেকেও সে নিঃস্ব, রিক্ত। দুঃখী বঞ্চিত ব্যর্থ। সে হীনমন্যতায় ভোগে। বন্ধুর মায়ের ডাক্তার ডাকতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে সে একটি পা হারায়। সেই বন্ধু এখন ওয়েস্ট জার্মানিতে। আর এ বুড়ো বাবা মা ও তিন ভাইবোন নিয়ে দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে চাকরি করে টিউশান পড়িয়ে লোকজনের মুখোমুখি না হতে চেয়ে কলকাতার নির্জন রাস্তায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়।

এই বৈপরীত্য চরিত্রটিকে অনন্যতা দিয়েছে। বাস্তবজীবনে যার সৌন্দর্য আনন্দ নেই, নেই তার অবকাশ, মনে মনে সে প্রবল রোমান্টিক—"হু, মে ফ্লাওয়ার ও রাধাচূড়া গাছগুলি বৈশাখী হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাসের মতন শব্দ করে। মেয়েদের মুচকি হাসির মতন একটু সময়ের জন্য ঠাণ্ডা পরিচ্ছন্ন জুঁইয়ের গন্ধও টের পাই। বলতে কি, সবটাই আমার কাছে ভীষণ রোম্যান্টিক মনে হয়। বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মৃদু হয়ে আসে। আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়। আমি খুশি হই, আমার এত ভালো লাগে, ঘুরতে ঘুরতে যখন এই রাস্তায় চলে আসি।"[৩]

কিন্তু এর সঙ্গে আছে নির্মম বাস্তব। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়ে দেয়—স্যার বেশিদিন বাঁচবে না, ভীষণ রোগা হয়ে গেছে, কিংবা কাটা পা নিয়ে স্যার কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না। তবু মনোহর মার্জিত কিছু খুঁজে সে। কেননা সে জানে চিতায় না ওঠা পর্যন্ত কোনো সাধ বা পিপাসাই মরে না।

তাই সে এক ব্যালকনির উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীর কাছে পৌঁছে যায়। অবস্থান পৃথক। কিন্তু প্রকৃতি ও নারী এক হয়ে যায় তার কাছে। কিন্তু কী পায় সে নারীর কাছ থেকে? উপর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া কিছু মুদ্রা। চাকর এসে সেই ভিখিরিকে জানায়—পয়সা না নিলে পুরোনো শার্ট পাঞ্জাবি সে নিতে পারে।

গল্পের শেষে এসে গল্পকার আমাদের চমকে দেন। এক নির্মম নিষ্ঠুর রূঢ় কর্কশ বাস্তবের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। ছুরিতে কেটে ফালা ফালা করে দেন। কুৎসিৎ দর্শন, অক্ষম, দরিদ্র এক মানুষের সৌন্দর্য পিপাসু রোমান্টিক মন পৃথিবীর কারো কাছে কানাকড়িও মূল্য পায় না। মানুষ তাকে পরিণত করে ভিখারিতে। প্রতিকারহীন এই চিরন্তন এই বেদনার করুণার ভয় ও অসহায়তার পাশে আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি।

দারিদ্র্য কবিকে মহান করেছিল খ্রিস্টের সম্মান দিয়েছিল।[৪] অন্য এক আধুনিক কবি জানিয়ে দেন দারিদ্র্য তার জামাইবাবুকে মহানও করেনি খ্রিস্টের সম্মানও দেয়নি এক চোরা

আঢ়কাঠিতে পরিণত করে।[৫] আবার প্রতিবাদী এক গল্পকার জানান—দারিদ্র্য শুধু অমানুষকে অমানুষ করে না। কখনও কখনও অমানুষকেও মানুষ করে। কোনো বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় দারিদ্র্য মানবজীবনের অভিশাপে। সেই দারিদ্র্য মানুষকে কেমন নিঃসঙ্গ করে, প্রকাশ্যে অপমানিত করে এবং স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়—তার নগ্ন রূপ নির্মম বাস্তবচিত্র আঁকেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পে। কেমন এই তারিণী? কেমন তার এই সংসার? কয়েকটি লাইনে লেখক তাকে স্পষ্ট করে দেন—

"....তারিনীর বউ ঘরের সামনের ছোটো রকটুকুর ওপর রোজ সকাল সন্ধ্যা একটা তোলা উনুন ধরিয়ে নিয়েছে। প্রেস-ফেরত তারিণী রেশনের থলে, কখনো বা বাজার অর্থাৎ বালির ডিবে কি ডাঁটামুলো নিয়ে ঘরে ফিরছে লম্বা পা ফেলে। আর তারিণীর এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হোস-পাইপের মুখে, রাস্তায়, লোকের বারান্দায়, উড়ের পানের দোকানের সামনে, যোগেশ রুদ্রের ডাইং ক্লিনিং—এর দরজায় হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি মারামারি করে পাড়া গরম রেখেছে, রাখছিলো এ অবধি।"[৭]

এই তারিণীর বাড়ির আব্রু ঘুচে যায় একদিন। সব বের করে ঠেলায় রাস্তায় তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। তার সমস্ত সংসার যখন একটা ঠেলায়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা পথে তখনই অপমানের চূড়ান্ত ঘটে। মুদি থেকে দুধওয়ালি সবাই এসে দাঁড়ায় তারিণীর সামনে। যা বাকি আছে সব মিটিয়ে দিয়ে যেতে বলে। নইলে ঠেলা ছাড়বে না তারা। ঠেলাঠেলি টানাটানি তর্ক বিতর্কে ক'টা জিনিষ ভেঙে যায়। প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে মজা দেখে। নানা ভাবনা ভাবে, মন্তব্য করে,বিচার করে, নিন্দা করে। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না তারিণীর পাশে। দাঁড়ায় না কথা অথবা অর্থ নিয়ে।

অবশেষে দরিদ্র, অক্ষম অম্বলের রোগী তারিণী চিৎকার করে সব বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তার নিয়তি তাকে তার নতুন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না। প্রত্যক্ষদর্শীরা পাড়ায় রসিয়ে গল্প করে ছেলে মেয়ে বউ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সবকে ঠেলায় বসিয়ে নিজে ঠেলা টেনে নিয়ে যায় এবং দুর্ঘটনায় পড়ে। তারিণী কি আত্মহত্যা করতে গেল? তারিণীর ছেলে মেয়ে বউ কি সবাই মারা গেল? না সার্থক শিল্পী লেখক তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। অসাধারণ সমাপ্তি আনেন গল্পের—যে গল্প শুধু তারিণীর নয়, যে গল্প ধারাবাহিক এবং নির্মম নিষ্ঠুর পৃথিবীর করো কিছু আসে যায় না তারিণীদের ধ্বংসের জন্য—

'সে কথার উত্তর দিতে কেউ নেই, যে যার ঘরের দিকে চ'লে গেছে। দেখা গেলো, অদূরে লম্বা টর্চ হাতে তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরের দরজায় তালা খুলতে খুলতে বাড়িওলা নতুন কোনো এক ভাড়াটিকে বাড়ির জলকল, পায়খানা ও রসুইঘরের চমৎকার ব্যবস্থার কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনাচ্ছে।"[৮]

দরিদ্র তারিণীর শারীরিক মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু আর এক দরিদ্র কেরানির মানস মৃত্যুর, মেরুদণ্ড ভাঙার গল্প শোনান জ্যোতিরিন্দ্র 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে। ইট সিমেন্ট খসে পড়া, জলপড়া, স্যাঁতস্যাঁতে বাড়ি, রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত রুটি, বাতের রোগির স্ত্রী, অফিসের ফাইল খুলে মশা তাড়ানো,—এমনই এক কেরানির বাড়িতে নতুন ভাড়াটে হিসেবে আবির্ভাব

ঘটে এক সুন্দরী স্ত্রীর—যার বর স্যুটেড বুটেড হয়ে কেবল বাইরে ঘুরে বেড়ায়। ফলে ছোটোখাটো প্রয়োজনে নবাগতা মহিলা মিষ্টি হেসে এই দরিদ্র মানুষটির শরণাপন্ন হয়। আর তাতেই কৃতার্থ হয়ে যায় সে। রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল লাল আলো মায়াময় ঠেকে। মায়াময় হয়ে যায় কেরানির জীবনও। তার স্ত্রীপুত্র কন্যা, ঘর সংসার জীবনযাপন সব অসহ্য ঠেকে তার কাছে। এদিকে মহিলা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় চকোলেটের বাক্স, আপেল, ব্লাউজের টুকরো শাড়ি। আর কেরানির ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে সেই মহিলা। 'জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।' মহিলাকে মাংস এনে দিয়ে কৃতার্থ হয় সে। সেই মাংস রাত্রে বাড়ির সবার জন্য একবাটি দিলে গোটাটাই খেয়ে নেয় সে। আর—'অবশ্য একটু পরেই আলো নিভলো। আমার দুকান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। বেশ কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবন তপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ।'

ধীরে ধীরে অনেকখানি অগ্রসর হয় কেরানি জীবন সেই মঙ্গলগ্রহের নারীর দিকে। সেই সৌন্দর্য কল্পনার। স্বরচিত জগতে বুঝিবা তার মুক্তি ঘটবে। নতুন জীবনের স্বাদ পাবে সে। কিন্তু তার সেই দিবাস্বপ্নকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দেন লেখন। মাছ কুটতে গিয়ে রক্তের ফোঁটা মহিলার গালে পড়লে এবং একাধিকবারের চেষ্টায় তা মুছতে ব্যর্থ হলে—নারীটি, তাকেই তো মুছে দিতে বলে। তাই করে কেরানি। 'হাত কাঁপছিল আমার, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।' সামান্য মাংস আনিয়ে রিক্সা ডাকিয়ে, বাড়িতে জিনিস পাঠিয়ে যে প্রত্যাশার ফানুস ফুলিয়েছিল সুন্দরী নারী তার মধ্যে কী ছিল তাই যেন গল্পের পরিণতিতে জেনে যায় কেরানি—

"....দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেষ করি।"

"ততক্ষণে উনুনের কাঠ ক'খানা তো কাটিয়ে নিতে পার ওকে দিয়ে।"

"....তা উনি কেটে দেবেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, কুলদাবাবুকে দিয়ে তোমার জন্য নিচে থেকে একটিন সিগারেটও আনিয়ে রাখবো ভেবেছি।"[৯]

ঠিক এভাবেই ধনি দরিদ্রের সম্পর্ক করুণা নির্ভর হয়ে, দাস্য ভাবনায় পীড়িত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সংসারে। স্বপ্নের ভুবন ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেন্টে দাঁড়িয়ে তার এত দিনের নির্মাণ করা ভবন একটি আঘাতে বিনষ্ট হয়। মানুষের হাতে মানুষের এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা, শ্রেণি অবস্থান না বুঝে অবুঝ পাগল মন যখন সংসারের রূঢ় বাস্তবতা থেকে অন্য গ্রহে পালিয়ে বাঁচতে চায় তাকে এভাবেই ধাক্কা খেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরতে হয় জীবনে যে ক্ষত আর শুকোয় না হয়তো।

সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক পরিবেশে, সামান্য আয়োজনে একটি রাজনৈতিক গল্প হয়ে ওঠে 'পাবর্তীপুরের বিকেল'। প্রায় সব গল্পের মতো এখানেও সংবাদটুকু দেবার আগে অনেকটা সময় জুড়ে একটা অন্যরকম পটভূমি তৈরি করেন লেখক। যদিও শহিদ বেদীর একটা আভাস দিয়ে দেন—কিন্তু গল্প যে তাকে নিয়েই হবে এমনটা আঁচ করতে পারি না আমরা। বরং দুই বন্ধুর বাস ট্রেন ধরার তাড়া, আর তার মাঝেই গাঁয়ের ভদ্রলোককে পেয়ে যাওয়া, তাঁর বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করা এবং আস্তে আস্তে নানা প্রসঙ্গ অপ্রসঙ্গের মূল জায়গায়

শুধু মতিকে নয় আমাদেরকেও এক অন্য জগতে পৌঁছে দেয়। সারদা যখন বলেন—

"তারপর আর কি, পাকা আম খাইনি তো খাইনি, তাই বলে কি আমি বাগানের গাছগুলির ওপর রাগ করেছিলাম, না গাছের যত্ন করিনি। বরং গত বছর আমি আমার নিষ্ফলা আম বাগানেই বেশি সময় কাটিয়েছি। ওদিকে জামের বাগানে জাম পেকে ঝরে ঝরে নিচে পড়েছে। ঘাসের ওপর হাঁটু উঁচু কালো জাজিম তৈরি হয়েছে পাকা জামের, কিন্তু আমি একবার ওদিক মাড়াইনি। হুঁ জামরুল পেকে পেকে সবকটা গাছ সাদা হয়ে গেছে। কাঠবিড়াল আর রাজ্যের পাখি পেট ভরে জামরুল খেয়েছে—আমি একবার এখানে চুপি দিতে আসিনি।'[১০]

তখন তিনি বুনো—সত্যি বনের রাজা। শুধু পাখি নয় দরিদ্র পাতাকুড়ুনি মেয়েও বনের থেকে ফুলফল লতাপাতা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। প্রকৃতি এখানে পটভূমি নয়, রহস্যময় নয়, রোম্যান্টিক নয়, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক নয়, চরিত্রের ভাব প্রকাশক নয়—নয় কোনো আধ্যাত্ম্য ব্যঞ্জনার আধার। নিছক প্রকৃতিই। সে স্বতন্ত্র সে সুন্দর। মানুষের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য যোগ। আজ শহরের নাগরিক জীবনের উন্নয়নের ধুলো ময়লায় যা মৃতপ্রায়।

কিন্তু এই প্রকৃতি যেন পূর্ণতা পায়, গল্পটি যেন গল্প হয়ে ওঠে সারদা যখন রোদের জন্য নাতিকে উলঙ্গ করে মাথায় প্যান্ট দেওয়া করান এবং নিজেও উলঙ্গ হয়ে পুকুরে স্নানে নামেন। এবং অনেকক্ষণ ধরে জলে ডুব সাঁতার দেন—দিতে থাকেন। তারপর পাঁক, শ্যাওলা, শাপলা, মাছ সবকিছুর গন্ধ গায়ে মেখে সারদাও হয়ে যান বন। নাতি তা প্রাণে উপলব্ধি করে—

'....তার কাঁধের ওপর দাদুর হাত। দাদুর গায়ের গন্ধ চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগছে। মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না! কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। নাতি বুঝল।...'[১১]

বনের গন্ধ মননের গন্ধকে ছাড়িয়ে মানুষকে তার আপন সত্তায় আপন জননীর স্নিগ্ধ স্পর্শে নিয়ে যায় যেন।

"খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর" এ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায় যেন। গোপন এক চিত্রকর খালপোলে লুকিয়ে নানা ছবি আঁকে। তা মানুষের খোরাক যোগায়—মননের হোক বা নিছক আনন্দের। শিল্পী আঁকে ফুল লতাপাতা মাছপাখি। ইঁটের গুঁড়ো আর কাঠকয়লা দিয়ে। তারপর ছবির বিষয় বদলাতে থাকে। বিজ্ঞবৃদ্ধ তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলেন, কত ব্যাখ্যা তাঁর শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে। যুবকও এক তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। তারপর এল সাপ ব্যাঙ বিছা টিকটিকি। ক্রমে একদিন দেখা গেল অনেকগুলি মেয়ের মুখ। ব্যাস। গেল গেল রব পড়ে গেল। সেই বৃদ্ধ সেই যুবক অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করলেন শিল্পীকে। শিল্পী গণপ্রহারের শিকার হল। কিন্তু সে বুঝে গেল জনরুচি। বুঝে গেল শিল্পি ও শিল্পের বাজার।—'মনে হয়, একটা ভাল বাজার পেয়ে গেছি।' সে সেই বাজারে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। বউ তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়, সে আগে যেন মেয়ে বৌদের ছবিগুলি বের না করে। চিত্রকর জানায় আগে কালী, দুর্গা, পরমহংসটংস তারপর...।

মুখোশপরা মধ্যবিত্তের রুচির কথা এভাবেই একটি কিঞ্চিৎকর গল্পে অনবদ্য কৌশলে আত্মপ্রকাশ করে—লেখকের বুননে বা চিত্রাঙ্কনে।

৩

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু গল্পে দাম্পত্য জীবন—তার সুখ, অসুখ, অতৃপ্তি, যৌনাচার, বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিকারের ছবি আছে। এগুলি দাঁড়িয়ে আছে মূলত নারী মনস্তত্ত্বের ওপর। এ গল্পগুলিও জ্যোতিরিন্দ্র বলেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। সেই বর্ণনা, মনটাকে টেনে আনা। গল্প নয়, ঘটনার অভিঘাত নয়, নাটকীয় মোচড় থাকলেও তা চমকে দেওয়ার মতো নয়। কেবল বর্ণনা বর্ণনায় এমন করে নারীর অন্তর্রহস্য উন্মোচন তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। এবং তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে পুরুষ চরিত্রটিও। দাম্পত্য—দীর্ঘকালীন সহবাস একসঙ্গে থাকা তবু যেন এক নারী পুরুষ কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। মাঝখানে রয়ে যায় এক অনন্ত ব্যবধান। আর সেই ব্যবধানের শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে বিচিত্র ভাবনা বিচিত্র অভিব্যক্তি। লেখক যেন ডুব দিয়েছেন সেই মাঝখানের অনন্ত চেতনায় আর তুলে এনেছেন অন্তরের গূঢ় গভীর অভিব্যক্তিকে—যা মাঝে মাঝে বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'সমুদ্র' তেমনি এক গল্প। গল্পের কথক তাঁর স্ত্রী হেনাকে নিয়ে সমুদ্র দেখতে এসেছেন। উঠেছেন সমুদ্রতীরের হোটেলে। পেয়েছেন এক মামাকে—যে বিচিত্র চরিত্র। যে তার ভাগ্নের কুকুরকে সমুদ্রে ফেলে দেয়, ঠেলে ফেলে ডুবিয়ে মারে তার স্ত্রীকেও। গল্পের কথক তার স্পর্সে আসেন। সমুদ্র তাকে পাগল করে, তাঁর মনের সীমানা বাড়িয়ে দেয়, ঢেউয়ের দৃশ্য আর রাত জেগে শোনা সমুদ্রের শব্দ তাকে তাঁর দাম্পত্যের ছোটো সীমানা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। তাকে অস্বাভাবিক করে। সমুদ্রের নেশায় স্ত্রীকে ঘৃণা করতে শুরু করেন তিনি। "ইচ্ছা করছিল, ঘরের বাইরে ওই বালির বিছানায় একটা ঝিনুক হয়ে আমি অনন্ত কাল শুয়ে থাকি। হেনা নেই, সংসারে আর কেউ নেই। যেন এমনও ইচ্ছা করছিল, সকাল হতে সরাসরি ওকে জানিয়ে দেব তুমি ফিরে যাও, আমি এখানে থেকে যাব।"[১২] স্ত্রীর প্রতি তিনি যে শুধু বিরক্ত হন তাই না তাকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করেন। আর এটা সংক্রমিত হয় ওই জনৈক মামার সংস্পর্শে, যে নিজে এই কাজ করেছিল।

ধীরে ধীরে গল্পকার মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে সংলাপে, বর্ণনায়, ঘাত প্রতিঘাতে মানসিকতায় চরিত্রটিকে তৈরি করেন। স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা, সমুদ্রের নেশা এতখানি জায়গা জুড়ে লেখক বর্ণনা করেন যে বিষয়টি আদৌ অবিশ্বাস্য ঠেকে না। অবশ্য আমরা বুঝি না এই দাম্পত্যের মধ্যে এই ঘৃণা জিঘাংসা কোথায় কী কারণে বাসা বাঁধে। দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমিতা? স্ত্রীর পুরোনো হয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, দাম্পত্যের ক্ষুদ্রতা, সমুদ্রের অসীমতা—কোনো কারণ চরিত্রটিকে স্ত্রীর কাছ থেকে সরিয়ে আনে। তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তোলে এবং তাকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে ঘাতকে পরিণত করে। কুড়ি বছর রাত জেগে ঢেউয়ের গর্জন শুনে যে মামা যে অস্বাভাবিক, কেবল তারই সংস্পর্শ কি কথককে এমন নিষ্ঠুর করে তুলেছিল নাকি তার জিঘাংসা প্রবৃত্তির মূলে ছিল কোনো দাম্পত্য অসুখ। স্ত্রী

হেনাকে স্বামীর কাছে অনেক ছোটো জগতের ছল মনে হয় আমাদের। কিন্তু সে তো স্বাভাবিক। আর কথনই বা কোন মহিমান্বিত বৃহৎ জগৎ আবিষ্কার করেছে? তার একী কেবল অবচেতনের বিকার বিকৃতি? অবদমিত আকাঙ্ক্ষার সুযোগে প্রকাশ? এর উত্তর মেলে না। তবু মামা, গল্পের কথক, সমুদ্র, কথকের প্রতিক্রিয়া ঘৃণা আক্রোশ পাগলামির কাছে আমরা থমকে দাঁড়াই। এক অচেনা রহস্যময় জগতে লেখক পৌঁছে দেন আমাদের—বিস্ময় বিমূঢ় করে দেন। কে কবে মনের অতলশায়ী দুরাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পেয়েছে? লেখকই তো তাকে উন্মোচিত করেন, চিনিয়ে দেন, জানিয়ে দেন পাঠককে। বাংলা মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় চির রহস্যাবৃত মানবচরিত্র ও মানবমনের বিচিত্র অভিব্যক্তির পরিচয় হয়ে অভিনবত্বে, স্বাতন্ত্র্য বর্ণনার অসাধারণ দক্ষতায় দাঁড়িয়ে থাকে সমুদ্র গল্পটি।

'বন্ধুপত্নী' ও সুখী অসুখী দাম্পত্যের চিরচেনা ছবি। স্বাভাবিক দাম্পত্য কোনোদিন গড়ে ওঠেনি সুধাংশু ও রেবার। বিয়ে হওয়ার পর তারা মাঝে মাঝে একসঙ্গে থেকেছে—কিন্তু একসঙ্গে থাকা ও সংসার করা বলতে যা বোঝায় তা হয়ে ওঠেনি। কেননা সুধাংশু থাকে কলকাতায় আর রেবা থাকে বেনারসে। সুধাংশু মার্চেন্ট অফিসের দরিদ্র কর্মচারী আর রেবা স্কুলের শিক্ষিকা। রেবাই অনেকবার এসেছে কলকাতায়—কিন্তু তা ব্যয়বহুল বলে আর আসতে চায়না সে। এমনকী সুধাংশু যখন কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে আসার কথা বলে তখন রেবা সক্রোধে জানিয়ে দেয়—যে কাকুরা তাকে মানুষ করেছে তাদের ছেড়ে সে কখনো কলকাতায় আসবে না।

নিঃসঙ্গ অসুস্থ সুধাংশুকে সুবিনয় নিয়ে যায় তার বাসায় পেয়িংগেস্ট করে। একখানা ছোটো ঘরকে পার্টিশন করে দুভাগ করা হয়েছে। দারিদ্র্য সেখানেও নগ্ন বেআব্রু। নিত্যসঙ্গী কিন্তু সুবিনয়ের স্ত্রী অরুণা সহ্য করার মুর্তিমতী নারী। সুবিনয়ের নিত্য ধমক সে হাসিমুখে সহ্য করে, রাত বারোটা পর্যন্ত ঘরের কাজ সামলায়।

তারপর সেইদিন বৃষ্টির রাতে জেগে থাকে সুধাংশু—আলাপ সংলাপ শুনতে চায় সুবিনয় অরুণার। স্ত্রী-সুখ বঞ্চিত সুধাংশুর কাছে এটাই স্বাভাবিক ছিল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে সে দেখে অরুণা তার জানালার পাশে। এবং সুধাংশুর মনে হয়—"আপনাদের বলেছি এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত, মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু সাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ আমাকে, হ্যাঁ রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিষ্পন্দন হয়ে রইলাম। গায়ে ব্লাউজ ছিল না।"[১৩] এ ভাবনা যৌনতা। এ বাসনা কামনা রঙিন। তবু তার মাঝে জেগে থাকে মাতৃমহিমা—'স্বল্প হেসে আমি বিচিত্ররূপিনী আর এক নারীকে দেখলাম। রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। রাগী স্বার্থপর স্নেহ মমতাহীন রেবা। এটি মা। স্নেহশীলা জায়া।"

কিন্তু স্ত্রী বঞ্চিত, প্রেম, দেহ বঞ্চিত সুধাংশু, হিংস্র উন্মত্ত পশুর মতো ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা সজোরে চেপে ধরে। অরুণা সে হাত সরিয়ে নেয় না বরং সুধাংশুর বজ্রমুষ্টির মধ্যে তার নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দেয়। তারপর ধীর ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'এ মাসে

ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামাকাপড় করাতে হবে; ছিছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এ নিয়ে তো ও আপিস কাছারি করছে।' একথা শোনার পর সুধাংশুর বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে তার হাত নীচে গড়িয়ে পড়ে।

যৌনতা নয়, এ গল্পে পরিণতি দাঁড়ায় বেদনায়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে যৌনতাকে ঘিরে থাকে এমনি এক অপরিমেয় বেদনা। কেন এসেছিল অরুণা মধ্যরাতে স্বামীর বন্ধুর জানালায়? অভিসারে? বঞ্চিত স্বামীর বন্ধুকে উষ্ণ স্পর্শ দিতে শরীর বা মনের? কেন চেপে রাখতে দিয়েছিল সেই হাত? আর তারপর স্বামীর বন্ধুর টাকায় স্বামীর অফিসের কাপড় কেনার কথা বলেছিল সে। এর মধ্যে কোনটা বড়, কোনটা প্রধান? অথবা ছলনা, মায়া, মোহাবেশ তৈরি করে স্বার্থসিদ্ধি?

এসব প্রশ্ন ভিড় করে আসে মনে। এর কোনো উত্তর নেই। উত্তর দেওয়ার কাজ লেখকের নয়? কেইবা জানে মনের কত আকাঙ্ক্ষা বদ্ধদুয়ারে মাথা কুটে মরে। কিন্তু যে শরীরী বাসনা উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল সামান্য সময়ে লেখক তাকে ঢেকে দেয় দারিদ্র্য আর স্বামীর প্রতি কর্তব্যের লড়াইয়ের এক ধীর শান্ত করুণ বেদনায়। যৌনতার এক গল্প হয়ে ওঠে অনাবৃত দারিদ্র্য ও অসহায়তার ধীর আর্তনাদ। জ্যোতিরিন্দ্র এখানে অনন্য।

'চন্দ্রমল্লিকা' গল্পটিও এমনি বেদনাবিধুর। যৌনতা সেখানেও পর্যবসিত করুণ বেদনায়। গাঢ় গূঢ় বিষাদে বেদনায়। ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে অব্যক্ত করে হৃদয়ের গহনে ফের ফিরিয়ে দেওয়ায়। এ এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। সব কামনা হৃদয়ে রেখেও তাকে ধূসর করে আমাদের ফিরতে হয় গোপন গুহায় তাকে ঠাঁই দিতে হৃদয়ের গহনে। মনের অন্দরে—যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। 'চন্দ্রমল্লিকা'র শুরুও শেষ আগাগোড়া এক বেদনায় মোড়া। অথচ বেদনাকে ঢাকা দেওয়ার সবরকম প্রয়াস নেওয়া হয়েছে নারী পুরুষ দু-জনের দিক দিয়ে। শোকের প্রকাশ যাতে না হয় সদ্যমৃত বন্ধুর স্ত্রীর (নিজের সহপাঠিনীও বটে) কাছে সেজন্য ভালো করে সাজগোজ করেন কথক। গরদের পাঞ্জাবি, শান্তিপুরী ধুতি, চকচকে জুতো।—

"বন্ধুর জন্য শোক করতে, বন্ধুপত্নীকে সমবেদনা জানাতে বর্ষা পার করে শরতের এই নীল সোনাঝরা দিনে আমি আসব কেন। আমি চাইছি না তোমার বিষণ্ণতা? দীর্ঘশ্বাস, শোক-ম্লান গাঢ় ধূসর দৃষ্টি, যেন দেখা হওয়া মাত্র স্বচ্ছ হাসির আলোয় ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত করে তুলতে পারব আমি, বিনু হাসবে।

"এতকাল আসনি কেন বলবে না ও, বলবে—'এতো আশা করেছিলাম, তুমি আসবে।"[১৪]

তারপর শোকাতুর বিনতার সহজ আচরণ। বন্ধুর দেওয়া লাল গোলাপ চুলে গুঁজে নেওয়া। অপরেশের প্রসঙ্গ আসে। বিনতার নানা ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ানো। টুকরো বিচ্ছিন্ন সংলাপ। পর্দা সরিয়ে প্রসাধনও সেরে আসে বিনতা। কাজল পরে। শাশুড়ী কাশীবাসিনী হয়েছেন, দেওর দাদার অফিসে কম বেতনের চাকরি পেয়েছে। সদ্য স্বামীহারা একলা নিঃসঙ্গ। বিনতা ঘরে একা থাকে, ফুলের বাগান নিয়ে কখনও বা। বন্ধুর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা টের পায় বিনতা। তার হাত ধরে 'চুপ করে আছ।' অপরেশ এই সুন্দর বাগান

দেখলে খুশি হত। বাষ্পাচ্ছন্ন হয় বিনতার চোখ। মনে হয় দুই নারী পুরুষের মাঝে এসে দাঁড়ায় অপরেশ।

একটি সস্তা যৌনতার গল্প হতে পারত এটি। অথবা বান্ধবী, বন্ধুপত্নীকে বিবাহ করে শোক ভোলানোর ইতিকর্তব্য। অথবা বিবাহ না করে মন বা শরীরের যৌন সম্পর্ক—যৌন চাহিদা মেটানোর গল্প। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র অনবদ্য উপসংহার আনেন গল্পটির। দুই নারী পুরুষের ভাবনার মাঝে থাকে মন, বন্ধু, সমাজ, নীতি—আরো কত কী! সব আকাঙ্ক্ষা সব স্বপ্ন ভাষা পায় না, মাটি পায় না। অথবা আমরা বুঝতে পারি না আমাদের চাওয়াকে আমাদের ইতিকর্তব্য ঠিক করতে পারি না। জীবনে কিছুই সহজ নয় এমনকী যৌনমিলনও। এক অনবদ্য পরিণতিতে 'চন্দ্রমল্লিকা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম সেরা গল্প হয়ে থাকে তাই—

'তুমি কি আর বসবে?' আস্তে বলল, ও।

'না অনেকক্ষণ এসেছি। এইবেলা চলি।' কথাগুলি কেমন যেন মুখে জড়িয়ে আসছিল আমার। 'অনেক বেলা হল।'

'আবার কবে আসছ?' প্রশ্ন করল ও। দ্বিধাহীন প্রশ্ন।

'আবার'—আমতা করছিলাম : 'আবার কবে ঠিক—'

'না আর এসো না।' চোখে আঁচল চাপা দিল ও। আর দাঁড়াল না। ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। খোঁপাটা আবার দেখলাম।

সবটুকু গরিমা নিয়ে চন্দ্রমল্লিকা সেখানে স্থির হয়ে আছে।

'না আর এসো না'—এই সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে স্তব্ধ হয়ে আছে যুগযুগান্তের লক্ষ বছরের বিশ্বজোড়া নারীর ক্রন্দন। অব্যক্ত বেদনার রাশি, অস্থির দোদুল্যমান ঝঞ্ঝাকে স্থির করে রাখার কঠিন প্রতিজ্ঞা। গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার দ্বন্দ্ব সহাবস্থান। সমাজ ও মন। আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা, ভোগ ও ত্যাগ।

এরই একশোভাগ বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে 'পতঙ্গ' গল্পের নারীটি। রূপা। শরীর তার কাছে ভোগের বস্তু। অধ্যাপক গিন্নি সে। কিন্তু অধ্যাপক বাইরে চলে গেলে পলাশ অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র রূপার দেহজ আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে মরে। অধ্যাপক টের পান নিশীথ নামে তাঁর আর এক ছাত্র এ বাড়িতে রূপার কাছে আসে। যদিও তা অস্বীকার করে রূপা। নিশীথ যেন কোনোদিন এখানে না আসে—অধ্যাপকের এই নির্দেশকে মেনে নেয় রূপা।

পলাশ দগ্ধ হয় সেই আগুনে। কেটলির গরম জল বাথরুমে শীতল হয়। 'কতক্ষণ দু'জন বাথরুমের ঠান্ডা সিমেন্টের ওপর শুয়েছিলাম খেয়াল ছিল না।' পলাশকে পরের দিন দুপুরেও আমন্ত্রণ জানায় রূপা। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় পলাশ তারই ভূমিকায় দেখে নিশীথকে। এবং রূপাকে খুন করে।

গল্পটি অস্বাভাবিক নয়। বাস্তবতা তার প্রধান গুণ। নারী চরিত্রের এই বহুকামিতা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই বিকার সমাজের দান। অন্যদিকে পলাশের আকর্ষণ এবং রূপার আগুনে ঝাঁপ দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতার ঈর্ষায় খুনের বিষয়টি অস্বাভাবিক

ঠেকে। এই হত্যা নির্মম এবং হয়তো বা কিশোরোচিত নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিশোর চরিত্রগুলি পরিণত। তাদের যৌনবাসনা অবরুদ্ধ কামনা তার বহিঃপ্রকাশ জ্যোতিরিন্দ্র জীবন্ত করে দেখিয়েছেন। বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণা বা আকাঙ্ক্ষা যা আমরা সচরাচর স্বীকার করতে চাই না তাকে অনাবৃত করেছেন। আজকের সমাজবাস্তবতার দিকে তাকালে মেনে নিতে হয় জ্যোতিরিন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টিকে।

অন্যদিকে রূপার দাম্পত্যের এই অপূর্ণতা, অঞ্জনের 'নষ্টনীড়' আমাদের ভয় করুণা ঘৃণা সবকে উদ্দীপিত করে। নারী চরিত্রের এই আচরণ যতই অনৈতিক ও বেদনাদায়ক হোক—তার অনিবার্যতা বা স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না। লেখক শুধু শুভবোধের কথা বলতে বাধ্য নন হয়তোবা কিন্তু এই বিকৃতির কার্যকারণ সমন্বয় ছাড়া উপস্থিতি আমাদের আহত করে—সন্দেহ নেই।

'গিরগিটি' গল্পের মায়া আর এক বিচিত্র নারীচরিত্র। তার মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। অবশ্য রূপার সঙ্গে একটি বিষয়ে তাদের মিল আছে—দুজনেই তারা নিঃসঙ্গ। স্বামী কর্মস্থলে চলে গেলে তাদের অখণ্ড অবকাশ হয়তো বা তাদের ভিন্নপথে চালিত করে। কিন্তু মায়ার বিষয়টি রূপার মতো দেহজ নয়। বরং লেখক এখানে মায়ার এক অদ্ভুত প্রবণতাকে দেখিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাকে উন্মোচিত করেছেন।

নার্সিসাস বা আত্মরতির বা আলস্যের না কাটা অবকাশের এ এক আশ্চর্য বিলাস—"মায়া একটানে গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে একপাশে ও দুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও। ...এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপটায় শাড়িটা এক সময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যেতে হাড় ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধবাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে।"[১৫]

মায়াও দাম্পত্যে অসুখী। দিনরাত তার স্বামীর মুখে তার রূপের প্রশংসা তার ভালো লাগে না। বাড়ির কর্তা কাজের মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছেন—স্বামীর মুখের এই গল্প তার কাছে কদর্য অশ্লীল ও অশ্রাব্য ঠেকে। অথচ পাশের টিনের চালায় ময়লা ঘরে থাকা নোংরা স্টোভ সারাইওয়ালা এক বৃদ্ধের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় সে। আশ্চর্য এই চরিত্র—

"চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সব দেখা শেষ করে মায়া আবার বুড়োর মুখটা দেখতে লাগল। দুটো চোখ গর্তে ঢুকে পড়েছে। কপালের চামড়া ঠেলে পাকানো দড়ির মতন একটা শিরা বেরিয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন দুটো চোয়াল। নাকটা উঁচু, গাল কপাল শুকিয়ে যাওয়ার দরুণ আরো বেশি উঁচু দেখাচ্ছে। গলায় বুকে ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শিয়রের কাছে শূন্য এলুমিনিয়ামের ডেকচিটা পড়ে আছে। দেখে মায়ার দু-চোখ আবার ছলছল করে উঠল। একটু সময় ইতস্তত করে তারপর ও আস্তে ডাকল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন কি? ঘুমোচ্ছেন?"[১৬]

এ এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি। স্বামীর মুখে আর তার প্রশংসা নয়। সে অন্য কারো কাছে

তার বাইশ বছরের যৌবনের স্বীকৃতি চায়। গাছপালা পশুপাখি—এরা তাকে দেখে বলে তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি অনুভব করে সে। আর স্বীকৃতি দেয় চালচুলোহীন অস্থিচর্মসার সেই বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে মায়া সেই বৃদ্ধের সংসারে প্রবেশ করে, তার চুল্লি ধরিয়ে দেয়, তার মশলার যোগাড় করে, তার আনা ফুল খোঁপায় পরে। তার কাছে রূপের প্রশংসা শুনতে চায়। আর প্রণবের অসুখী জীবনের মর্মান্তিক আর্তনাদ ট্র্যাজিক হাহাকার ফেটে পড়তে থাকে—'সুখী না, বিয়ে করে এই জীবনে কেউ সুখী না।' কিংবা—

'প্রণব তার নিজের সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য হিসাব কারো কাছে তুলে ধরতে পেরেছে কি। পারল না। পারে না বলেই বুকের মধ্যে একটুকরো কান্না নিয়ে মাটির অন্ধকার থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। একটি মোটে তারা সেখানে।"[১৭]

সেই ছোটো তারারা শান্তি বয়ে আনবে এই আশায় প্রণব অপেক্ষা করে গাঢ় গুঢ় রাত্রির।

বিবাহিত জীবনে মানুষের এই নিঃসঙ্গতা, এই একলা হয়ে যাওয়া এমন নির্মমভাবে দেখান জ্যোতিরিন্দ্র যা তাঁকে আধুনিকতার দোরগোড়ায় এনে দেয়। অন্যদিকে মায়া—

"...কেননা মায়া জানে এখানে এখন চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখতে প্রণবকে ডেকে আনলেও সে তা দেখতে পাবে না। পারে না। সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ? সেই কান নেই।"[১৮]

এইভাবে একই ঘরে থাকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সবচেয়ে নিকটবর্তী দুই মানুষ। আর মায়া সেই সর্বহারা হাড় গিলে চেহারার বৃদ্ধের হাতের ফুল মাথায় গুঁজে নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতি তার কাছেই খুঁজে পায়। কেননা বৃদ্ধ জানায়—'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বালব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে ক'রে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি। দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।' রূপরস গন্ধ চেহারা সৌন্দর্য নয়—তবে কি নারী সারাজীবনে খোঁজে সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টি প্রণবের ছিল না, ছিল সেই বৃদ্ধের। তাই—

"যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠেছিল। এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটাই ও হতে দিলে না। ভয় কান্না দুটোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। 'বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন?"

এ কী! নারী স্বাধীনতা, নারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ? বন্ধনমুক্তি? নাকি অবাধ সঞ্চরণের ব্যভিচার। অন্যকে বঞ্চনা, শঠতা। জীবনটা যে যার নিজের—এমন স্বাধীনতা কি কাম্য? খুব মহৎ বৃহৎ সৃষ্টি নয় 'গিরগিট'। কিন্তু তীব্রভাবে আধুনিক। পাঠকের মনে পড়বে এই নারীর কাছে 'সামনে চামেলি'র ব্যালকনির সেই নারীকে।

'জ্বালা' গল্পে নারীর আর এক বিচিত্র মনকে আঁকেন জ্যোতিরিন্দ্র। শহরের নিস্তব্ধ দুপুরে যখন কোনো কাজ নেই, অসহ্য গরম, তখন এক কুৎসিত দর্শন শানওয়ালা নীরার মেয়ে পিন্টুর ডাকে তাদের ঘরে আসে। দা বঁটিতে শান দেয়। পিন্টু তার সঙ্গে গল্প করে, গল্প করে যায়। আর শানওয়ালা গল্প শুনিয়ে যায়। একসময় জানায় তার বৌকে কেটে ভাসিয়ে

দিয়েছে সে। নীরা জানতে চায় তার কি স্বভাব ভালো ছিল না? শানওয়ালা জানায় খেতে দিতে না পারলে সুন্দরী বউকে ঘরে রেখে কী হবে?' এই কথা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নীরার মনে। এই গল্প বরং অত্যন্ত সংক্ষেপে মনস্তত্ত্বের গূঢ় সাংকেতিক রূপকে অত্যন্ত সার্থক ভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। যা কম বলে আমাদের অনেকখানি ভাবিয়ে নেয়।

'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা'ও মনস্তাত্ত্বিক গল্প। কিন্তু এ গল্প সহজ, স্বাভাবিক নিত্যদিনের। স্বামী পরিত্যক্তা কুন্দ পাশের ফ্ল্যাটের বিবাহিত জুটির বউ রেবার কাছে যখন তখন আসে এবং অস্বাভাবিক যৌনতা ঘেঁষা কথা বলে। খাওয়া, শোওয়া, খোঁপা ভাষা—সব কথাই যৌনতা ঘেঁষা, অধ্যাপককে রেবা নালিশ করলে অধ্যাপক স্বামী জানিয়ে দেন—'ওর অবদমিত কামনা আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এগুলো। তোমার আমার গোপন কথা টেনে এনে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে রসিয়ে রাখতে চাইছে ও।' কুন্দর কৌতূহল রাত্রে বিছানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এবং কাঁচে পা কেটে তার শাস্তিও পায় না। কুন্দর প্রতি সমবেদনায় আমাদের মন ভরে যায়। মানুষের জীবন যন্ত্রণাময়। সেখানে এক অসহায় নারী যে তার কামনাকে চরিতার্থ করতে চায় অন্যের সুখে তাকে বিকৃতি বলা চলে কিন্তু তাতে তার যন্ত্রণার নিঃসঙ্গতার মুখ কামনার আসান হয় না। তাই সে বলতে পারে—'তা অত ভাবতে হবে না বৌ—সেরে যাবে। পায়ের কাটা ঘা ক'দিন থাকে, ঘা শুকোয় না মনের।" কুন্দর বেদনা আমাদের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন লেখক?

৪

কয়েকটি গল্পের লবকুশ কিশোর এবং সদ্য তরুণরা। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র কিশোরদের শুধু কিশোর হিসেবে দেখেননি। তাদের মধ্যেকার — যৌনতাকে স্পষ্ট করেছেন। সমালোচকের এই উক্তি যথার্থ।[১৯] একমাত্র 'বনের রাজা'র মতি স্বাভাবিক। কিন্তু 'শ্বাপদ' গল্পের কিশোরটি আত্মসচেতন, সিগারেট খাওয়া, সুন্দরী মেয়ের ছবি রাখা, দাড়ি গোঁফ কামানো সবই করে। এ বিষয়ে লেখক আদর্শায়িত করেননি এই যুবককে। এমনকী তার প্রেম করার, প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিষয়টিও আনেন। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে যায় আর এক কিশোর। সোদপুর থেকে আসা গেঁয়ো জংলীভূত তার মাসতুতোভাই গণেশ। এবং ক্রমে সেও সভ্য ভদ্র হয়ে একেবারে তার প্রেমিকাকে পর্যন্ত গ্রাস করে নেয়। ছ'ফুট লম্বা, ফরসা, সাঁতারে এবং গাছে চড়ায় দক্ষ এই তরুণ কিশোর—নায়ক উপলব্ধি করে—'যাকে বুড়ো বলতাম গাড়ল বলতাম। সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সে অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুচিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।'

'নীল পেয়ালা'র ছেলেটিকে এই বয়সে ভর করে মৃত্যুচিন্তা, 'ত হলেও আমি মরব, ইচ্ছা করেই মরব।' প্রেমের কথায় সে দ্বিতীয় মৃত্যুর সংকেত পায়, তার পকেটে থাকে সিগারেট। আর বৈদ্যনাথ ভাবেন এ কিশোর আর কিশোর নয় সে লোলাম বৃদ্ধ হয়ে গেছে।

'চোর' গল্পে দুই কিশোরের মানসিকতার পরিচয় আছে। মদন যা করেছে তা এত জীবন্ত যে তা অনায়াসে শিল্প হয়ে উঠেছে—লেখকের গল্প তৈরির কারিকুরিতে। আর যার পেঁপে

গাছ চুরি গেল সেই গরিব ছেলেটির ভাব হয়ে যায় বড়োলোকের ছেলে সুকুমারের সঙ্গে— মদন পেঁপে গাছ চুরি যার বাড়িতে নিয়ে গেছে। আর গল্পের নায়কের উপলব্ধি বেদনাদীর্ণ—

"আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও বাড়ির শাড়ি গয়না পরা প্রগলভ স্বাস্থ্য সুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনাঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম— থাকতে আরম্ভ করেছি।

আর কোনোদিন আমি ও বাড়ি যাইনি।"[২০]

'পতঙ্গ' গল্পের পলাশের কথা আমরা আগেই বলেছি। রূপার সঙ্গে তার শারীরিক মিলন ও তাকে হত্যা করা, জেলখাটা—কৈশোর যৌবন সব স্বপ্নময়তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে নগ্ন করে দেয় রূঢ় জীবনকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে কোনো আবরণই রাখেন না।

৫

গল্পের কাঠামো বিন্যাস, অবয়ব, নির্মাণ, গল্প কথন রীতিতেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একটি নিজস্ব পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর অনেকগুলি গল্প উত্তম পুরুষে লেখা। সে কিশোর হোক অথবা যুবক। খুনি হোক বা বিকৃত মস্তিষ্ক। 'সমুদ্র' গল্পে দীর্ঘ দীর্ঘ অনুচ্ছেদ, মনের প্রতিক্রিয়া ও ক্রুরতাকে কত সহজে প্রকাশ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, 'ডিটেলস' তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঘটনার ঘনঘটা নেই। নাটকীয়তা নেই, কিন্তু যা বর্ণনা করেন তাকে স্পষ্ট মূর্তি দান করেন। সেই 'ডিটেলস' বর্ণিত হয় নিখুঁতভাবে—

'বজ্রমুষ্টি আমার নাক কপাল লক্ষ্য করে ছুটে এল না। বরং আস্তে আস্তে তার শক্ত মুঠিটা খুলে গেল, আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল, জলেভেজা পেট মোটা আঙুরের রঙের নরম ফোলা ফোলা আঙুলগুলি আমার নাকের সামনে টেবিলের ওপর নেমে এল। তারপর আবার সব-কটা আঙুল একত্র করে সিগারেটের বাক্সটা মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে প্রভাত আর একটা সিগারেট বার করতে ব্যস্ত হয়। মৃদু হেসে তার দিকে দেশলাইটা ঠেলে দিই।"[২১]

তৃতীয়ত, তাঁর গল্পে প্রকৃতির অফুরন্ত ব্যবহার। সেই প্রকৃতি কখনও চরিত্র—চরিত্রের মানসিক অবস্থা বাস্তব পরিবেশ প্রকাশে অনন্য—

"বস্তুত যদি এ বাড়ির দোতলা থেকে আর ওপর থেকে নিচের দিকে কেউ তাকায়, দেখবে ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পুরনো একটা শ্যাওড়া গাছের সামনে একটা টগরফুলের কুঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কুঁড়ির পিছনে এত বড় একটা লাল টগর। লাল টুকটুকে ফ্রক লাল শাড়ি পাওডারের ছোপ লাগানো নরম তুলতুলে মাখন রং শরীর আর মা ও মেয়ের মাথার কালো কুচকুচে আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন চুলের সামনে ময়লা গামছা পরা হাড় ও শিরাবহুল রুক্ষ শরীর কুৎসিত দৃষ্টির মানুষটার এ ছাড়া যেন অন্য তুলনা ছিল না। আর জ্যৈষ্ঠ দুপুরের প্রতপ্ত আকাশের নীচে দাঁড়ানো ঐ পুরনো জীর্ণ গাছ আর দুটি তাজা ফুল ও কুঁড়ির সঙ্গে এই শহরের সম্পর্ক আছে প্রমাণ করতে যেন গরম অ্যাশফল্ট কাঁপিয়ে খানিকটা পোড়া পেট্রলের গন্ধ ছড়িয়ে একটু আগে একটা ট্যাক্সি ছুটে গেছে। আর কেউ নেই চারদিকে, আর কিছু ছিল

না। কেবল বঁটি শানের ধাতব কঠিন শন্‌শন্‌ শব্দ আর আগুনের ফুলকি আর—"[২২]

এখানে প্রকৃতি মানুষ পরিবেশ চরিত্রের মানসিক অবস্থা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রকৃতির নৈসর্গিক অসাধারণ ব্যবহার আছে অনেক গল্পে। সেখানে প্রকৃতি কোথাও পটভূমি মাত্র, কোথাও অবস্থা দ্যোতক। কোথাও চরিত্রটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। কোথাও সেই সৌন্দর্য পাঠককে অভিভূত করে রাখে। গল্পের সঙ্গে এমন অনিবার্যভাবে মিশে থাকে যা পৃথক কিছু বলে মনে হয় না। আনন্দে, বিষাদে বিস্ময়ে, বিরক্তিতে—সর্বত্র প্রকৃতিকে আশ্চর্য দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং এর সার্থক অভূতপূর্ব ব্যবহার 'গিরগিটি' গল্পে সার্থকতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে—

'কোথায় ডালিম চারা, কোন্‌দিকে।' যেন খুব বেশি চমকে উঠল মায়া। আঙুল দিয়ে ভুবন উঠোনের একটা পাশ দেখিয়ে দিতে মায়া সেদিকে তাকায়। অনেকদিন আগেই ওটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন নতুন করে ও ডালিম চারাটা দেখতে পেল। চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল। আঙুল ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার মিলমিশ। হাওয়ায় দুলছে নড়ছে যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুলে বিলি কাটছে আর খিলখিল হাসছে। আর একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া। আধফোটা একটা কলি সিঁদুরের রেখা হয়ে পাতার মাঝখান থেকে উঁকি দিয়ে একবার তখনি লুকিয়ে যাচ্ছে।...সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিলখিল হাসল।"[২৩]

একটি নারী, নারীর মন, একটি গাছ, একটি পুরুষ, একটা পুরুষের দেখা, পুরুষের চোখে মেয়েটির নিজেকে দেখা কী অসাধারণ ছবি দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

চতুর্থত, বৃষ্টির ব্যবহার উল্লেখ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রিয় বিষয়। এ বর্ষাও অপ্রাসঙ্গিক হয়নি কোথাও। বন্ধুপত্নী গল্পে পরিবেশ সৃষ্টিতে বর্ষা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। 'বৃষ্টির পরে' গল্পেও।

পঞ্চমত, উৎপ্রেক্ষা অলংকার লেখকের যেন খুব প্রিয়। যেখানে সেখানে এর ব্যবহার রয়েছে তা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়নি কখনো।—

যেন শ্রাবণ আকাশের অগুণতি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাছের মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে।

যেন এক একটা গাছের ডালের মাথায় লাল সবুজ কালো পাথরের মালা ঝুলিয়ে রেখেছে কে।

যেন জং ধরা খসখসে গলায় নতুন ধাতুর ধার শোনা গেল।

ষষ্ঠত, উপমাগুলিও চমৎকার। অর্থাৎ তাঁর গল্পে একটা কাব্যিক পরিবেশ কার্যত বজায় থাকে—যা হালকা মনোহর উপাদেয়। অবশ্যই বিষয় সম্পৃক্ত—

"আকাশটা সুন্দর ছিল। ভারি সুন্দর আকাশ। মেঘ ছিল। বকের পাখার মতন শাদা ধবধবে দুখণ্ড মেঘ পশ্চিম দিকে চুপ করে শুয়ে ছিল। আর সারা আকাশ জুড়ে গভীর নীল

প্রশান্তি। আর কিছু ছিল না। একটা পাখিও না। দূরগামী উদাসী কোনো চিলের ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও ছিল না। ছিল শুধু ঝকমকে রৌদ্র, অফুরন্ত নীল আর বকের পাখার মতন দুটুকরো সাদা মেঘের আশ্চর্য সকালে তার কথা আমার মনে পড়ল। সবুজ ঘাসের বুকে বিরল শিশিরবিন্দু কখনো সোনালী কখনো বেগুনী নীল দ্যুতি নিয়ে থেকে থেকে জ্বলছিল। আর সেই ঘাসের শিশির ঘিরে হলদে প্রজাপতিরা দল বেঁধে নাচছিল।"[২৪]

এ নিছক বর্ণনা নয়, কবিত্ব নয়, গল্পের পটভূমি রচনা মাত্র নয়—মূল গল্পের সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য বন্ধন।

সপ্তমত, চিতাবাঘের বাঘিনীর উল্লেখ একাধিক জায়গায় করেছেন লেখক। বিশেষত, নারীর সৌন্দর্য বোঝাতে। বোঝা যায় নারী শুধু কমনীয় সুন্দর নয় সে ভয়ংকর হয়েও সুন্দর হতে পারে।

অষ্টমত, বলেছি আমরা দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রচনা, বিবৃতি বা বর্ণনা বা বিবরণ তাঁর গল্পে বেশি। ন্যারেটরের ন্যারেশন সমধিক। সংলাপের উপর তেমন নির্ভর করেননি জ্যোতিরিন্দ্র। বরং গল্পের কথক বা উত্তম পুরুষের চরিত্রটি নিজে সব বর্ণনা করেছে। অন্যের মানসিক অবস্থা, পরিবেশ। অন্যের আঁতের কথা চটকে বার করা অথবা নিজের মনকে অনাবৃত করা—বিবৃতির উপর অধিক নির্ভর করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এমন নয় যে ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদ, ভাবনা বা টুকরো সংলাপ, ব্যবহার করেননি তিনি। কিন্তু যেন মনে হয়—মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে মনের অবস্থা বিশ্লেষণে সেই বর্ণনাই তাঁর সহায় এবং সার্থকতা—

"রূপা হাতের পিঠ দিয়ে আমার কপাল ছুঁয়ে দেখল। ওর পিঠময় ছড়ানো চুল। চুলে তেল দিচ্ছিল রূপা। তেলের সুগন্ধ হাতে লেগে আছে। যখন ও আমার কপালে হাত রাখল গন্ধটা নাকে লাগল। কিন্তু তেলের চমৎকার গন্ধে আমি ততটা অভিভূত হইনি যতটা হলাম ওর নিশ্বাসের গন্ধে। বস্তুত হাত দিয়ে কপাল পরীক্ষা করতে এত কাছে ও মুখ সরিয়ে এনেছিল যে ওর নিশ্বাসের ঝলক আমার চোখে মুখে ঠোঁটে এসে লাগল। সব মানুষের নিশ্বাস এমন মদির গন্ধ ছড়াতে পারে কিনা চিন্তা করছিলাম।...[২৫]

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর পাশে দীর্ঘ বিবৃতি না দিয়েও, কেবল কাটা কাটা সংলাপে অসাধারণ পরিবেশ তৈরি করেন। গল্প প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখে না। তীব্র আঘাতে পাঠককে সচকিত করে রাখেন এবং মূল বক্তব্যও প্রকাশ করতে পারেন—

'হাতে, কুড়ুল কেন?'

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ কি?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

'শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতন দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ। তার হৃদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সবকিছু অন্ধকার।'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হবে। পাঠক বাকি অংশ 'গাছ' গল্প থেকে পড়ে নেবেন। কী তীব্র দ্বন্দ্ব, গতিবেগ ও গঠন শৈলীতে গল্প পরিবেশন করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

নবমত, গল্প কথনে লেখক কখনও কথক, কখনও উত্তমপুরুষে কোনো চরিত্র, কখনও আমির মধ্যে 'সে' বলে দ্বৈত সত্ত্বার দ্বন্দ্ব অভিঘাত—নানা রীতি ব্যবহার করেছেন। কখনও সোজাসুজি কথা বলেছেন পাঠকের সাথে—

"আপনারা নিশ্চয় হাসছেন। তুমি এখানকার কেউ না কিছু না। এই শহরের কোথায় কোন ঘিঞ্জি পাড়ায় ধোঁয়া কালি গোলমালের মধ্যে কোনো নোংরা বস্তিতে থাক।...

"নেই। আমিও বুঝি কোনো কারণ থাকা উচিত নয়।...."২৬

খুব কি বড়ো কিছু সৃষ্টি করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। হয়তো নয়। অনিবার্য অবিস্মরণীয় তুলনাহীন কোনো গল্পের স্রষ্টা তিনি নন। কিন্তু বিচিত্র মানব চরিত্র বিশেষত নারী চরিত্রের মনের অন্দরমহলের, পুরুষের রিরংসা, হিংসা, দ্বেষ, জয় পরাজয়, অচরিতার্থ প্রবৃত্তি, এছাড়াও দারিদ্র্য, মানব চরিত্রের অসহায়তা প্রকৃতির কাছে, মনুষ্য-সৃষ্ট সমাজের কাছে পরাভূত মানবাত্মার আর্তনাদ, পশু প্রবৃত্তির কাছে মানুষের বন্ধন, মুক্তির পিপাসা, তার জন্য হত্যা, রক্ত, মৃত্যু— মানব মনের গহন অন্ধকার—এতসব দিককে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার সবটুকু শ্রেষ্ঠ নয় হয়তো বা কিন্তু নতুন তো বটেই।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আগাগোড়া জড়িয়ে থাকে এক বিষাদ। তাই তাঁকে আধুনিক করে তোলে। এই বিষাদ, এই অশান্তি অথবা শ্মশানের শান্তি এমনকী নদী ও নারী' গল্পের অসাধারণ আত্মত্যাগ সবকিছুর মধ্যে প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে যেন। 'বন্ধুপত্নী', 'গিরগিটি', 'চন্দ্রমল্লিকা'র নারী পুরুষরা মুক্তি খুঁজেছে। 'শ্বাপদ', 'চোর', 'নীল পেয়ালা', 'পতঙ্গ'র বয়ঃসন্ধি মর্মান্তিক পীড়ায় পীড়িত হয়েছে। সর্বত্র বেদনা, অশান্তি বিক্ষোভ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষকে জীবন্ত করে এঁকেছেন। বাংলা ছোটোগল্প তাঁর ভূমিকায় সমৃদ্ধ হয়েছে, বিচিত্র হয়েছে। বড় লেখক যুগ যুগ বাঁচতে পারেন। অন্য লেখকরাও এক শ্রেণির পাঠকের কাছে জীবনমৃত্যুর নানা কথা পৌঁছে দেন অনন্য ভাষা ও রীতিতে। বিচিত্র বিশ্বে বিচিত্র মানুষ ও পাঠকরা রয়েছেন। সুতরাং একজন মহীরুহ লেখকের চেয়ে ছোটোবড়ো মাঝারি অনেক বৃক্ষের কাছে মানুষ ছায়া ফল ফুল লতা পাতা আশ্রয় প্রার্থনা করে। বিচিত্র গাছের মতো বিচিত্র লেখক ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফল পাতা সুগন্ধ দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর তাতে ক্ষতি হয় না। জীবনের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বাড়ে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সেই বিচিত্র স্বাদ নিয়ে ভিন্ন রুচির অনেক পাঠককে তৃপ্তি দেবে—আপাতত—আরো অনেকদিন।

১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৩৩।
২. ঐ, পৃ. ২৫৬
৩. 'সামলে চামেলি' ঐ পৃ. ২৫৯
৪. দারিদ্র্য, নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা
৫. বেকারের চিঠি মণিভূষণ ভট্টাচার্য, নির্বাচিত কবিতা।

৬. সতীশদা, অমল মুখোপাধ্যায়, প্রতিবাদের গল্প, মিহির সেন, ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত।
৭. (১) পৃ. ১৬১।
৮. ঐ পৃ. ১৭০।
৯. ঐ পৃ. ১৮৩।
১০. ঐ পৃ. ৭৭
১১. ঐ পৃ. ৮৬
১২. ঐ, পৃ. ৪১
১৩. ঐ, পৃ. ১০৩
১৪. ঐ, পৃ. ২০৫
১৫. ঐ, পৃ. ১১১
১৬. ঐ, পৃ. ১১৩
১৭. ঐ, পৃ. ১২৫
১৮. ঐ, পৃ. ১২৬
১৯. ভূমিকা, ড. নিতাই বসু, ঐ, পৃ. ১৬
২০. (১) পৃ. ১৯৭
২১. বৃষ্টির পরে, ঐ, পৃ. ৬১
২২. জ্বালা, ঐ, পৃ. ২৫৩
২৩. গিরগিট, ঐ, পৃ. ১১৫
২৪. চন্দ্রমল্লিকা, ঐ, পৃ. ২০৫
২৫. পতঙ্গ, ঐ, পৃ. ২৩৮
২৬. সামনে চামেলি, ঐ, পৃ. ২৫৯